International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

ভাওয়াইয়া ও বাউল গানের শিকড়ের সন্ধানে

ড. সুখবিলাস বর্মা

এই আলোচনার মূল বিষয় ফোকলোর-লোকচর্চার শিকড় সন্ধান এবং আমার এখনকার আলোচনার বিষয় ভাওয়াইয়া ও বাউল গানের শিকড় সন্ধান। আপাতত দৃষ্টিতে দুটিই বাংলার লোকসংগীত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে ভাওয়াইয়া হল প্রকৃত অর্থে লোকসংগীত অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (লোকের) সংগীত, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে উত্তরবাংলার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজীবনের সুরধারা। উত্তরঙ্গের প্রকৃতি ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবনকে কেন্দ্র করেই ভাওয়াইয়ার সৃষ্টি। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে তৎকালীন কামরূপের রাজবংশী জীবন-মনন এবং প্রকৃতির অমূল্য সম্পদকে প্রতিফলিত করে, নিংড়ে নিয়ে যে সংগীত ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তার নাম ভাওয়াইয়া। কিভাবে, কোন পথে তা আলোচনা করা যাক।

সব লোকসংগীতের মতো ভাওয়াইয়াও আঞ্চলিক-অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চল, গোয়ালপাড়া, গৌরীপুর, কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাও ইত্যাদি নিয়ে আসামের পশ্চিমাঞ্চল দ্বারা সেই অঞ্চলের সীমারেখা চিহ্নিত করা যায়। এই এলাকার আঞ্চলিক জীবন, অর্থাৎ কৃষিনির্ভর শ্রমজীবন, আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ রাজবংশী ভাষা-ভাষার শব্দ সম্ভার, উচ্চারণভঙ্গি ইত্যাদি সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভাওয়াইয়া। আর একটু পরিস্কার করে বললে বলা যায় যে প্রাচীন কামরূপের রাজবংশী শ্রমজীবি মানুষ, মাটি ও প্রকৃতির একাত্ম বাঁধনে সৃষ্টি হয়েছে বিশিষ্ট সুর ও ছন্দে। যা কালক্রমে গড়ে তুলেছে সুর ও গীতরীতির আঞ্চলিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে আরও বিশিষ্টতা দিয়েছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি ও আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি। আবার কৃষি সমাজে উৎপাদক থেকে প্রণয়জীবন আলাদা নয়-শ্রম এবং প্রেম এখানে এক সাথে মিশে আছে। প্রেম-প্রণয়ের গান তাই পরোক্ষভাবে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। আবার এই প্রক্রিয়ায় কর্মজীবনে প্রকৃতির সঙ্গে তার সখ্য ও দ্বন্দ্ব। লোকসংগীত তাই প্রেম ও প্রকৃতির অবাধ বিচরণ ও মিলনের ফলশ্রুতি। কয়েকটি অতি জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া চটকার উল্লেখে বোধ হয় বক্তব্যটি আরও পরিস্কার হবে। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে বহুল পরিচিত গান ''তোর্ষা নদীর উতাল পাতাল রে''—তো নিছক বিনোদনের জন্য গান নয়। মাত্র কয়েক লাইনের এই গানটির মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনজীবনের উপর উত্তরবঙ্গের পাহাড় জঙ্গল নদী

নালা ভরা নিসর্গ প্রকৃতির প্রভাব এক নিমেষে চোখের উপর ভেসে ওঠে। আর শুধু তোর্ষা নয়, তোর্ষা এখানে ঐ অঞ্চলের—তিস্তা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধর, মুজনাই, ডুডুয়া প্রভৃতি সব নদীগুলির প্রতিনিধি। সব নদীর স্বভাবপ্রকৃতি মোটামুটি একই ধরণের। হিমালয়ের নানা স্থান থেকে বেরিয়ে আসা এই নদীগুলি বর্ষায় দুকুল প্লাবিত করে-দুই পার ভেঙ্গেচুড়ে জনজীবনকে ধ্বংস করে দেয়। নদীর এই অবস্থাকে বলা হয়েছে উথাল পাথাল, রাজবংশী ভাষায় উতাল-পাতাল। হিমবাহ ও বৃষ্টিপাত নির্ভর এই নদীগুলির জলধারা গ্রীষ্মকালে ক্ষীণ হয়ে যায়, বহু জায়গায় নদী হেঁটে পার হওয়া যায়। এই অবস্থার বর্ণনার গানও রয়েছে আব্বাস কণ্ঠে। ''প্রেম জানেনা (রসুক) কালাচান, কালা ঝুরিয়া থাকে মন, কতয় দিনে বন্ধুর সঙ্গে হব দরিশন বন্ধুরে। ও বন্ধুরে, নদী ওপারে তোমার বাড়ি যাওয়া আইসা অনেক দেরী, যাব কি রব কি সদায় করে মনা, হাঁটিয়া গেইতে নদীর জল, খাকলাং কি খুকলুং কি খাল্লাউ খাল্লাউ করে হায় হায় পরাণের বন্ধুরে''।

নদীগুলির বর্ষার রূপ ও গ্রীষ্মের রূপ থেকে উদ্ভুত হয়েছে নদী প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যার বিশেষ প্রভাব পড়েছে এখানকার ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতির উপর। বর্ষায় জলস্ফীতি ও জলোচ্ছ্বাসের ভাঙ্গন আর গ্রীষ্মের জল সঙ্কোচনের ফলে নদীগুলি প্রায়শঃই প্রবাহ পরিবর্তন করেছে। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য চরভূমি। কাঁদামাটি, বালু, পলিমাটির চড়ে অচিরেই গজিয়েছে বড় ঘাস, এলুয়া-কাশিয়ার জঙ্গল। দুই তিন বছরের মধ্যেই সেই চর সুন্দর গোচারণে পরিণত হয়েছে। সেখানে এলাকার জোতদার, জমিদার বা ধনী কৃষকের গরু মহিষ বাথান বা ভইষের বাতান গড়ে উঠেছে। এক দল (কম বেশী এক'শ) গরু মহিষ পালন পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হত ৬/৭ জন মৈশাল। হেফাজতে থাকা পশুগুলির দেখভালের কাজের অবসরে মৈশালেরা দোতোরা, বাঁশি, সারিন্দা বাজিয়ে মনের সুখে ও দুঃখে গাইত ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া সুরধারায় এভাবে যুক্ত হয়েচে মৈশালি ভাওয়াইয়া যা ভাওয়াইয়া আঙ্গিকের একটা বড় জায়গা দখল করে রয়েছে। আব্বাসউদ্দীন বা তাঁর বরপুত্র নায়েব আলি টেপুর গাওয়া ''ও বাঙ্গর ভইষের ওরে দাফাদার, ভইষ গেইল তোর চিলমারির বন্দরে না রে'', বা ''মৈষ চড়ান মোর মৈশাল বন্ধুরে, মৈশাল কোন বা চরের মাঝে,এলা ক্যানে ঘন্টীর বাজন না শোনোং মোর কানে মৈশালরে''। ইত্যাদি গান উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবনের, রাজবংশী সংস্কৃতির বড় পরিচায়ক। বাতান সন্নিকটস্থ গ্রাম থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা বাতানের পাশের রাস্তা দিয়ে নদীর ঘাটে

স্নান করতে বা জল আনতে যেত। সবার কানে আসত মিষ্টি সুরের দোতোরা বাদন ও ভাওয়াইয়া গান। এরই মধ্যে কোনও এক যুবতীর মন মজেছে সেই ভাওয়াইয়াতে। জলের ঘাটে আসা যাওয়ার পথে কয়েকবার দেখা হয়েছে—প্রেমালাপ হয়েছে পূর্ণ যুবা বয়সের মৈশালের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই এসে গেছে বর্ষার আগমন বার্তা মৈশালের বিদায়ের সময়। বর্ষায় চর ডুবে যাওয়ার আগেই মৈশালকে বাতান গুটিয়ে চলে যেতে হবে। মৈশালের চলে যাওয়ার তোড়জোড় দেখে প্রেমিকা তীব্র মনঃকষ্ট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। টেপুর কণ্ঠে সেই ক্ষোভ, ''ধিক ধিক ধিক মৈশালরে মৈশাল ধিক গাবুরালি এহেন সুন্দর কইন্যা ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি মইশাল রে"। প্রেমিকা ভাবছে যে তার মত সুন্দরীকে ছেড়ে মৈশাল চলে যাচ্ছে মানে সে নিশ্চয়ই অন্য কারুর প্রেমে পড়েছে—''তখনে না কইছং মৈশালরে, মৈশাল না যান গোয়ালপাড়া, গোয়ালপাড়ার চেংড়িগুলা জানে ধুলাপড়া মৈশালরে"।

একইভাবে এখানকার গাড়িয়াল ভাইয়ের জীবন নিয়ে—''বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে, কি ওরে ঐমতন মোর গাড়ীর চাকা পন্থে পন্থে ঘোরেরে, অকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে"র মতো গাড়িয়ালের গানগুলি এই সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে। কাঁদা জলের সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা বা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে চলার মতো একমাত্র যানবাহন ছিল গরু বা মোষের গাড়ি। সেহাটে কৃষকের আনাজ ধান পাট তামাক বয়ে নেওয়ার, বা সম্পন্ন ঘরের মেয়ে বৌ-দের না নাইওর করার একমাত্র উপায় গরু বা মোষের গাড়ি। ''ধীরে বোলান গাড়িরে গাড়িয়াল আস্তে বোলান গাড়ি, একনজরে দেখিয়া নেঙ মুই দয়ার বাপের বাড়িরে গাড়িয়াল ধীরে বোলান"।

উল্লেখ করতে হয় হাতীর গান বা মাহুতের গানের কথাও। উত্তরবঙ্গ ছাড়া, ভাওয়াইয়া শৈলী ছাড়া মাহুতের গান আর কোথায় আছে? উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির দুয়ারস্ অঞ্চলের, ভুটান দুয়ারের জঙ্গলে কাজে লাগানোর জন্য হাতী ধরার কঠিন কাজ করতেন গৌরীপুরের জমিদার ও কুচবিহারের মহারাজা। খেদা ও ফান্দি পদ্ধতিতে হাতী ধরার পর সন্ধ্যাবেলা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে মাহুতের কয়েকজন মিলে করত ভাওয়াইয়া গান, বাকিরা গানের সঙ্গে সঙ্গে ধৃত হাতীকে ট্রেনিং দিত—''হস্তীর কইন্যা হস্তীর কইন্যা বামনেরো নারী, মাথায় নিয়া কামকলসী ও, সখি হস্তে সোনার ঝাড়ি সখি ও, ও মোর হায় হস্তীর কইন্যারে যেদিন মাউত উজান যায় নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে"। হাতী নিয়ে, মাহুত নিয়ে এমনি

আরও কত গান ভাওয়াইয়া শৈলীর সম্পদ হয়ে আছে।

দারিদ্র ও বঞ্চনা গ্রামীণ জীবনের অভিশাপ। তাছাড়া সামন্ত সমাজে পুরুষ প্রাধান্য, বহুবিবাহ, বৈধব্য, শাঁখা-সিঁদুর প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌম গোষ্ঠীসমাজে এসেছে নতুন মূল্যবোধ, নতুন ধ্যান-ধারণা ও ধর্মচিন্তা। ব্রাহ্মণ্যবাদের বৈদান্তিক ধ্যানধারণা এই বিষয়গুলিকে আরও জটিল, আরও কলুষিত করেছে। সব কিছুর পরিণতিতে প্রেম সার্থকতা লাভ করেনি। বিরহ বিচ্ছেদ তাই লোকসংগীতের মূল সুর। এবং ভাওয়াইয়া ক্ষেত্রে এই অবস্থার বহুল প্রতিফলন। বিরহ বিচ্ছেদ বঞ্চনার প্রাধান্য-সেকালে ছিল, একালে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

ভাওয়াইয়া নিয়ে ভাওয়াইয়া সুরধারা নিয়ে আলোচনা এভাবেই এগিয়ে নেওয়া যায় এবং সেই আলোচনায় রাজবংশী জীবন ও সংস্কৃতির সবকিছুই উঠে আসে।

অন্যদিকে, বাউল বাংলার কোনও নির্দিষ্ট এলাকার বা জনগোষ্ঠীর সংগীত নয়, বা নির্দিষ্ট সুরধারা নয়। সেই অর্থে বাউল একটি সাধন সংগীত, ভৌগোলিক সীমা, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এই নির্দিষ্ট সাধনায় বিশ্বাসী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সংগীত। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কেমন সে সাধনা? বাউল বা বাতুল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে ''প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে ক্যানে করো''। বৈষ্ণব সন্তনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রকে বলা হয় বাউল আন্দোলনের প্রতিভু। বাউল সাধনা কি, কি তাঁর বৈশিষ্ট্য, কি সেই সাধন পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সার কথা বলেছেন লালন শাহের প্রধান শিষ্য দুদ্দু শাহ—

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তাঁর উল।
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে, চক্ষু না দ্যায় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে হয় রে কবুল।
বেদ তুলসী মালা টেপা এসব তারা বলে ধোঁকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা সব করে ভুল।
মানুষে সকলি মেলে দেখে শুনে বাউলে বলে
দীন দুদ্দু তাই বলে লালন সাঁইজির কুল।।

ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন যে এই সাধনায় মন্ত্র তন্ত্র মন্দির মসজিদ পূজা পার্বণের কোনও স্থান নেই। পূর্বজন্ম, অনুমানের কোনও জায়গা নেই এই সাধনায়। এই সাধনায় মানুষই পূজ্য, মানুষই ভজনার লক্ষ্যবস্তু। আবার এই গানেই রয়েছে

বাউল সাধন পদ্ধতির কথা। 'বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তাঁর উল। পুরোপুরি তন্ত্রের কথা। তন্ত্রে 'বস্তু'র অর্থ পুরুষের বীর্য। পরিস্কার যে এই সাধনার মূল তত্ত্ব হোল সাধন সঙ্গিনী সহ বাউলের রজঃ বীজের সাধনা-শশিভূষণ দাশগুপ্ত যাকে বলেছেন—Sexo-yogic practice.

'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গগন হরকরার এই গানে রয়েছে বাউল সাধনার সার কথা। এই ধারণারই সম্যক প্রকাশ পাওয়া যায় গগন হরকরার গানে অনুপ্রাণিত কবিগুরুর রচনায়—

''আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল থানে
আছে সে নয়ন তারায়, আলোক ধারায়, তাই না হারায়
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়, তাকাই আমি যেদিক পানে''।

এই মনের মানুষের আর এক রূপ 'অচিন পাখি'। এই 'অচিন পাখি' থাকে খাঁচার ভিতর। লালন শাহের গানে পাই—'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, তারে ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়'। এই অচিন পাখির সম্পর্কে জানতে হলে—তাঁকে ধরতে হলে জানতে হবে খাঁচাকে অর্থাৎ দেহকে। বাউল সাধনায় তাই দেহ সাধনা বা কায়াসাধনা। আর এই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা গুরুর, শিক্ষিত গুরুর। লালনের গান—

'গুরু দোহাই তোমারমনকে আমার লও গো সুপথে
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে।
তুমি যার হও গো সদয় সে তোমারে সাধনে পায়
বিবাদী তার স্ববশে রয় তোমার কৃপাতে।

জগাই মাধাই দস্যু ছিল, তারে গুরুর কৃপা হলো
অধীর লালন দোহাই দিল, সেই আশাতে।

বেদ পুরাণ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ শরীয়ত মূর্তিপূজা সবকিছুর ঊর্ধে বাউল গান। গানই এই সাধনার মূল মন্ত্র-মূল অস্ত্র। বাউল সাধনায় প্রভাব রয়েছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ, তান্ত্রিক হিন্দু, তান্ত্রিক বৈষ্ণবে সুফি ইসলামের। তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতবাদের অন্তর্গত বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণবের প্রভাব বাউল মতবাদে উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষণীয়। সহজিয়া অর্থাৎ সহজ, মানে সহজাত স্বাভাবিক পথে লক্ষ্য বস্তু লাভের উপায়।

ভাওয়াইয়া ও বাউল উভয়ই তাই 'লোকায়ত' সংস্কৃতির—লোকায়ত ধারার

অন্তর্গত। 'লোকায়ত' বলতেই উঠে আসে অন্যতম নাস্তিক মতবাদ চার্বাকের কথা। লোকায়ত লোকেসু আয়ত, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লোকায়ত ধারণাটির তাৎপর্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যথা, 'The view held by the common people', 'The system which has the base in common profane world', 'The philosophy that denies that there is any world other than this one'.

আস্তিক দর্শনের (orthodox philosopies) ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ও আত্মার অস্তিত্ব, দুঃখ বা বন্ধন থেকে পরম মুক্তির (ultimate liberation) সম্ভাবনা, কর্ম ও পুনর্জন্ম তত্ত্বে বিশ্বাস, বেদের অকাট্য সিদ্ধতার (validity) স্বীকৃতি ইত্যাদি বদ্ধমূল ধারণাগুলির (dogmas) কোনটিকেই চার্বাক বা লোকায়ত স্বীকার করেনা। এই মতবাদে মূল বিষয় হল ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষকরণ। লোকায়ত দর্শন তাই 'ব্যোম-এর অস্তিত্ব ও অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করে। সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান চারটি—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়ু। চেতনার উৎস দেহ যার মধ্যে রয়েছে জীবন বা প্রাণবায়ু। চেতনা জীবন থেকে অবিচ্ছিন্ন। দেহের ধ্বংসে চেতনারও ধ্বংস ঘটে। সুতরাং দেহান্তর বা পূর্বজন্ম বলে কিছু নেই। দেহ, চেতনা, ইন্দ্রিয় সবই স্বল্পস্থায়ী। জাতিভেদ প্রথা, যজ্ঞ(বলি), ব্রহ্মণ্যবাদ, বেদের অকাট্যতা ইত্যাদির বিরোধিতা করে স্বর্গের পশ্চাদ্ধাবন না করে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ-সম্পদ, কাম ইত্যাদির জীবনের মূল লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে না; তাই স্বর্গ, মর্ত্য, পাপ, পুণ্য, ভগবান, অদৃষ্ট ইত্যাদি অর্থহীন। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদি এবং সাধুসন্তবৃত্তি বিদ্যামত্তা ও পৌরুষবিহীন কিছু মানুষের জীবিকার উপায়। পুরোহিতরা নানা ধরণের পূজাপার্বণ উৎসবাদি করেন তাঁদের জীবিকার জন্য। প্রকৃতিই (nature) লোকায়তিকদের নীতিবাক্য (watchword)।

কিন্তু অত্যধিক স্বাধীনতা যে কোন ব্যবস্থাতেই নিয়ে আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। লোকায়তর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসেছে ব্যাপক ভ্রষ্টাচার। চার্বাক শব্দটির অন্য অর্থ বিনোদন বাক্য। স্বভাবতই বেদ-বাদিরা ছাড়াও, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্যরা চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে লোকায়তিকদের তত্ত্ব নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। এমতাবস্থায় মানুষের মনোযোগ আবার বেদের দিকে ঘুরে গেল; আত্মার আধ্যাত্মিকতায় ডুবে গেল মন প্রাণ। ব্যাস প্রচার করলেন আদর্শবাদী মতবাদ। চারদিক থেকে চাপে পড়ে লোকায়তিকরাও আদর্শবাদী দলে যোগ দিলেন। বৈদিক ভারত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভারতে পরিণত হল। এবং তান্ত্রিক ভারতেই

হল গড় ভারতীয়ের জীবন দর্শন।

দর্শন জনপ্রিয় সাহিত্যেঃ

সাধারণের জন্য অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণের গূঢ় রহস্যজনক জনপ্রিয় এই দর্শন রয়েছে কবিতায় এবং অতীন্দ্রিয় প্রকাশে। বুদ্ধিমত্তা (aql) নয়, প্রেম বা ইস্ক (isq)ই সেখানে প্রধান। এখানেই এসেছে সহজ কবির কথা যার কাছে এই পথ হল প্রকৃতি বা সহজের পথ, যা হৃদয়ের সরল অনুভূতির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত।

দার্শনিক তত্ত্বের সহজিয়াদের গানগুলি হল সহজ সরল আধ্যাত্মিক মননে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথায় ভরা, জীবনের বাইরে নয়। গ্রামের সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রচারিত তথ্য-অর্থাৎ যাত্রা, কবিগান, কীর্তন, বাউল, তুক-তাক, দেহতত্ত্ব, মনোশিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই এই দর্শনের মধ্যে পড়ে। এই জনপ্রিয় দর্শন শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে প্রেম মাধ্যমে মুক্তির তত্ত্বে। জৈন, ভাগবতবাদী এবং শৈবরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। ক্রমে বৈদিক বিশ্বাস ও অবৈদিক উপজাতি বিশ্বাসের মিলন মিশ্রনে গড়ে উঠল এক সমন্বয়ী হিন্দুধর্ম। মহাভারত হয়ে উঠল প্রধান ধর্মশাস্ত্র, যার নায়ক কৃষ্ণ। এর পরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধারায় প্রবেশ করল তন্ত্র যা লিঙ্গ ও জাতের বাঁধা দূর করে নিয়ে এল গণতন্ত্রের ধারা।

এর পরেই ভারতের পশ্চিম দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করেছে ইসলাম, ইসলামের সাম্যের বাণী নিয়ে সুফিসন্তরা, লোক দর্শনের বাহক হয়ে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা ফকির দরবেশদের কথা সাধারণ মানুষ অতি সহজেই আত্মস্থ করেছে। সিন্ধু অঞ্চলের ইসলাম-সুফি, হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্রে মিলিত হয়ে সুফিদের দরগায় ভজনা করেছে। একই ভাবে বাংলায় সহজের সাধনায় আউল, বাউল, দরবেশ, ফকির, সাঁই, কর্তাভজারা ভজনা করেছেন। সহজ হল একটি পন্থা, যার কেন্দ্রবিন্দু হল প্রেম ও সেই প্রেমের উৎসস্থান হল দেহ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাশগুপ্তর মতে সহজিয়া সম্প্রদায় বা সহজযান ইত্যাদি ধ্যান-ধারণাগুলি প্রধানত পিছিয়ে থাকে মানুষদের মধ্যে বর্তমান। তাঁরা সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এগুলো হল কৃষিকেন্দ্রিক জাদু অনুষ্ঠান। এবং স্বভাবতই সেখানে নারীপ্রাধান্য।

তন্ত্রেরও একই উপদেশ—বামা ভুত্বা যযেৎ পরাম। তন্ত্র সাধনায় স্ত্রী-শক্তিটি তন্ত্রের শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, যাকে তিনি বলেছেন—(exo-yogic

practice– যা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 'শক্তিধর্ম'।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব ঃ

তন্ত্রের দেহতত্ত্বের মূল কথা হল, মানব দেহকে বিশ্লেষণ করেই, মানবদেহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই আমরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকে বুঝতে পারবো, কেননা মানবদেহের রহস্য আর বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সমজাতীয়।

দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—''মনুষ্যদেহ একটি পূর্ণাবয়ব যন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে গুপ্ত ও সুত শক্তি। প্রকৃতির সকল গুপ্ত শক্তির সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক''। যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবনের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে এবং যে সাধনার বলে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই দেহতত্ত্ব শক্তি, বৌদ্ধ বা সহজিয়া যাহাই হোক না কেন, এঁদের প্রকাশ শ্রমনিরত সরল সাধারণ মানুষদের মুখে লোকসংগীত রূপে।

সাংখ্য দর্শনেরও একই কথা। সাংখ্যর ভাষ্যে গৌরপাদ বলেছেন—''যথা স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়''। 'সাংখ্যকারিকা'য় ঈশ্বরচন্দ্র প্রদত্ত ষষ্ঠীতন্ত্র নামটির পশ্চাতেও কৃষিভিত্তিক ধ্যানধারণার-তন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। সাখ্যের পরিভাষা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কৃষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং যে কৃষিভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজজীবনকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, সাংখ্য দর্শনের পিছনেও তারই স্মৃতি। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য হবে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাসঙ্গিক—

''আবার সাখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে''। ট্রাইবাল সমাজে ভাঙ্গন ধরবার পর এসেছে শ্রেণীসমাজ এবং সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ট্রাইবাল সমাজ ছেড়ে শ্রেণী সমাজের দিকে এগানোর জন্য অনুসৃত হয়েছে দুটো পথ—পশুপালন ও কৃষি। খাদ্য আহরন ও উৎপাদনের দিক থেকে এই সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়---শিকারজীবী এবং কৃষিজীবী। প্রাচীনদের পরিভাষায় আয়ুধজীবী ও বার্তাশস্ত্রপজীবী।

প্রাচীনদের মতে লোকায়তিকদের কাছে 'বার্তা' (কৃষি) ছিল প্রধানতম বিদ্যা। রবার্ট ব্রিফলট সহ পৃথিবীর সবদেশের নৃবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সহমত যে, একান্তভাবে মেয়েদের হাতেই 'বার্তা' বা কৃষিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে। কৃষিকাজ

মেয়েদের আবিস্কার।

কৃষি আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাদুবিশ্বাস। কৃষিবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ যে-জাদুঅনুষ্ঠান তাঁর মূল কথা হল নারীর প্রজনন শক্তির সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টা। আবার এই জাদু অনুষ্ঠানের মধ্যেই তন্ত্র সাধনার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তন্ত্র সাধনার অকৃত্রিম রূপ হল কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠান এবং তাঁর অন্তর্নিহিত আদিম বিশ্বাস। অনাবৃষ্টির সময়ে আকাশে জল ছিটিয়ে বৃষ্টির অনুকরণে আয়োজন-সংগীত, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য। নকল তুলেই ফলপ্রসু হওয়ার কামনা, প্রকৃতির ফলপ্রসূতার সঙ্গে নারীর ফলপ্রসূতার সম্পর্ক।

তান্ত্রিক ধ্যানধারণায় নারী প্রাধান্য। আচারভেদে তন্ত্র বলছে—

পঞ্চতত্ত্বং খপুস্পঞ্চ পুজয়েৎ কুলযোজিতম

বামাচার ভবেত্তত্র বামা ভুত্বা যযেৎ পরাম।

পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার, খপুস্প অর্থাৎ রজঃস্বলার রজ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে, তন্ত্রের এটিই প্রধানতম কথা। দেবী বা নারীপ্রাধান্য মূলক ধ্যান-ধারণাগুলির মূল সূত্র পাওয়া যায় কৃষি আবিস্কারের দিক থেকেই।

দেবী রহস্য ও উদ্ভিদ জগৎ ঃ

পিছিয়ে পড়া মানুষের আজও বিশ্বাস যে নারী দেহ থেকেই আদি শস্যের উদ্গম। দুর্গা পূজার সঙ্গে যুক্ত নবপত্রিকার পূজা-অনুষ্ঠান, রামপ্রসাদ চন্দ্রের মতে, দুর্গাপূজার কৃষি পর্যায়েরই স্মারক। রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতে, বাংলার সংস্কৃতির যে চোদ্দ আনাই তান্ত্রিক এবং বাংলার মাটিই যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার ক্ষেত্র, তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে রয়েছে বাংলার উর্বর জমির মধ্যে অর্থাৎ কৃষি বিদ্যার দিক থেকেই। কৃষি আবিস্কারের পটভূমিতেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুটি ধারার মধ্যে মাতৃপ্রধান তান্ত্রিক ধারাটিকে খুঁজতে হয়। নারীর উর্বরা শক্তি ও প্রাকৃতিক উর্বরা শক্তির সম্পর্ক নিবিড়। বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গাছ বা গাছের ডালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—''সে সব খাঁটি বাংলার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বাংলার তন্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর। ...বাংলার বাঙ্গালীকে ঠিকমতো বুঝিতে হইলে এই দেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তন্ত্রের ধর্ম বুঝিতে হইবে।'' তিনি আরও বলেছেন—''এই সকল তন্ত্র পুস্তকের মধ্যে বাংলার দুই হাজার বছরের

ইতিহাস লুকানো আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতিনীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে পারিলে বাংলার বহু রত্নের উদ্ধার হইতে পারে....। তাঁর আরও বক্তব্য—'ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাংলার বহু জালজুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছেন, স্মার্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। এই সকল আবরণ খুলিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে'।

তন্ত্রে নারী জননাঙ্গের উপর অত গুরুপ্ত আরোপ করার মূল কারণ হল এক আদিম বিশ্বাস যে স্ত্রী-জননাঙ্গ শুধু সন্তানদায়িনী নয়, শস্যাদি ঐশ্বর্যদায়িনীও। বন্দ্যোপাধায় মহোদয় আরও মনে করিয়েছেন—''আমরা যে দশভুজা দুর্গার পূজা করি, সেখানে পূজা হয় ভদ্রকালীর,পূজা হয় পূর্ণঘটের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে। যন্ত্রটির নাম 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'। এটি তন্ত্রের একটি বিখ্যাত যন্ত্র 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'-'মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতম্'।"

এই তন্ত্র যন্ত্রটির মূল কথা কি? উত্তর হল—অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা-নারীর জননাঙ্গের প্রতীক। তান্ত্রিক রচনায় পদ্ম সোজাসুজি এই অর্থেই গৃহীত-পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে।

নারী জননাঙ্গ 'সর্বতোভদ্রমণ্ডলে'র উপর স্থাপিত হয় একটি ঘট, ঘটের গায়ে সিন্দুর পুত্তলিকা মানবীয় প্রজননের পূর্ণাঙ্গ নকল। শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে শুরু হয় ফসল ফলানোর মহড়া। তাই প্রাকৃতিক উৎপাদনে সংকট দেখা দিলে মেয়েরা নগ্নতার সাহায্যে সংকট দূর করতে চায়। উল্লেখ্য উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, মির্জাপুর জেলার অনুষ্ঠানের কথা এবং উত্তরবঙ্গের হুদুম দেও-এর কথা। ফসল তুলেই ফলপ্রসু হওয়ার কামনা, প্রকৃতির ফলপএসূতার সঙ্গে মেয়েদের ফলপ্রসূতার সম্পর্ক।

প্রজনন ও জননাঙ্গঃ লতা সাধনা ও তান্ত্রিক যন্ত্র

তন্ত্র সাধনায় ব্যবহৃত চিত্রের যন্ত্রগুলি স্ত্রী-জননাঙ্গের প্রতীক। কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকেই এই যন্ত্রগুলির উদ্ভব। আদিম মাতৃপ্রধান বা শক্তি-প্রধান চিন্তাধারা ক্রমশই নারী-জননাঙ্গ কেন্দ্রিক হয়েছে। প্রজননের কামনা, ধন উৎপাদন ও কৃষিকাজের সাফল্য কামনা সব কিছু নিয়েই জননাঙ্গ কেন্দ্রিকতা। তন্ত্র মতে যন্ত্রেই দেবতার অধিষ্ঠান; আধুনিক তান্ত্রিকতা অনুসারে বিখ্যাত কয়েকটি যন্ত্র হল—গনেশযন্ত্র, শ্রীরামযন্ত্র, নৃসিংহযন্ত্রর, গোপালযন্ত্র, কৃষ্ণযন্ত্র, শিবযন্ত্র,

মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র ইত্যাদি।

ব্রিফলট দেখিয়েছেন যে চাষবাস শুরু করার পর থেকে খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত জাদু অনুষ্ঠানের মূল কামনা ছিল পৃথিবীর উর্বরা শক্তির বৃদ্ধি এবং অনুষ্ঠানে মূল অঙ্গ মৈথুন।

ভাওয়াইয়া ও বাউল উভয়ই লোকায়ত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, উভয়ের শিকড় তাই নিহিত রয়েছে তন্ত্রে। বাউল সাধনার গানে তন্ত্রের প্রভাব পরতে পরতে সাধনার সব গানেই দৃষ্ট ও অনুভুত হয় এই প্রভাব। ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্র, ভাওয়াইয়ার জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষি, তন্ত্র সেখানে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত। তবে ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে পরিস্কার ভাবে এই প্রস্তাব বুঝতে হলে আলোচনায় আনতে হবে ভাওয়াইয়া আঙ্গিকের প্রাচীন গান-মনোশিক্ষা, দেহতত্ত্বের গান বিশেষ করে তুক-খা গানের উদাহরণকে। আমাদের আলোচনা ইতিমধ্যে অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। কয়েকটি তুক-খা গান উল্লেখ করে শেষ করব এই আলোচনা।

(১) ও মন চিনিয়া নেও তাকে
দেহার ভিতর ভাবের মানুষ বিরাজ কইর‍্যাছে।
.....
আট কুটুরি নয় দরজা সব দরজায় তালা
কোন কুটুরিত্ ভাবের মানুষ করে নীলাখেলা।।

(২) ও তুই শাস্তর খুলি দ্যাখ দেখিরে মন
ও তোর দেহাত আছে গয়া কাশী পেরেগ বিন্দাবন।
সর্গ মর্ত্য পাতাল আছে রে মন, আছে তিন ভুবন
তার মধ্যে দ্যাখ চইদ্দ ভুবন আঠারো মোকাম।।

(৩) বিরখের মূলে তে-ধারা নোধী উজান পাখে সোত চলে
হেমন বিরখ হরিহর সিজালেক কি বাদে।
আর সদায় নোধী তরঙ্গ উঠ্যা
দিবানিশি দুইটা মানসি সাতারো কাট্যা
ও নোধীর না ধরে বৈধা
উজান পাখে সোত চইল্যাছে নোধীর উঠ্যাছে ফ্যাপনা।

(৪) গুরু তা না না গুরু তা না না ভাব দিলে ভাব ক্যানেবা আইসে না।
ও মুই আলিটা কাটিয়া ড্যারুটা বসানু রে
গুরু ঐটে হইল মোর তা না না
ভাব দিলে ভাব ক্যানেবা আইসে না।
ও মুই হাঁটুয়া ডিঙ্গিতে চখিটা নড়ানু রে
গুরু ঐটে হইল মোর তা না না
ভাব দিলে ভাব ক্যানেবা আইসে না।

.....ইত্যাদি ইত্যাদি।।